শোধ

হরিশ মুখুজ্যের বাড়িটি আজ বহু বছর পর আবার উৎসবের কোলাহলে মুখরিত। মুখুজ্যেরা এক কালে এ তল্লাটের ধনী পরিবার বলে খ্যাত হ'লেও, অবস্থা পড়তে পড়তে এখন দুর্দশার নিম্নতম ধাপে এসে পৌঁচেছে। সেকালের দোল-দুর্গোৎসব-কালীপুজোর জাঁকজমক দূরে থাক, দু'বেলা পেটপুরে অন্নসংস্থানও ক্রমশঃ দুষ্কর হয়ে উঠেছে - যদিও ধনী বনেদী বংশের যে সব উপসর্গগুলির সঙ্গে সবাই সুপরিচিত সে সব এঁদের পরিবারে কোনদিন প্রবেশ করেছে বলে শোনা যায়নি। পুরুষানুক্রমে সৎ ও চরিত্রবান বলে সুনাম ও সম্মান অর্জন করে এসেছে পরিবারটি। বরং স্থানীয় লোকেরা বলে, সততা ও সচ্চরিত্রতার বাড়াবাড়ি রকমের বাতিকই নাকি কালে তাঁদের কাল হয়ে দাঁড়ায়। তিন ম'কারের মিলিত পরিণতি থেকেও দ্রুততর গতিতে এবং সুনিশ্চিততর রূপে ধ্বংসের মুখে পৌঁছে দেয় এই ধনি-মানি-দানী বংশটিকে।

সমাজে থাকতে হ'লে কয়েকটা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য থেকে অব্যাহতি নেই মানুষের। কোন রকম ওজর-আপত্তি-অক্ষমতার অজুহাত দিয়েই দায় খণ্ডন করা যায় না। গত ক'বছর ধরে যে দায়টি হরিশ মুখুজ্যের কন্ঠদেশে কাঁটার মত বিঁধেছিল এবং যে কারণে তাঁর আহার-নিদ্রা শিকেয় ওঠার জোগাড় হয়েছিল, তা হ'ল কন্যাদায়। তাঁর একমাত্র কন্যা কাদম্বিনীর, এতদিনের চেষ্টায়, সম্বন্ধ স্থির হয়েছে এবং আজ তার বিবাহ। পাত্রের নিবাস কোলকাতা। ছেলেটি দেখতে শুনতে ভাল, অল্প বয়স, আই.এ. পাশ। পাত্রের বাবা পোর্ট কমিশনারে কাজ করে। বলতে গেলে আশাতীত রকমের ভাল পাত্রই পেয়েছেন এবং গত চার বছরের প্রচেষ্টা যে সার্থক হয়েছে, এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেছে। গত চার বছর ধরে গো-খোঁজা করে পাত্র খুঁজে বেড়িয়েছেন হরিশ মুখুজ্যে এবং মেয়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর আরও মরীয়া হয়ে উঠেছেন। তবে কথাতেই বলে, সব ভাল যার শেষ ভাল। আজ এই শুভ দিনে এতদিনকার হয়রাণি ও দুশ্চিন্তা ভুলে কোমর বেঁধে শুভকার্যে নেমেছেন আত্মীয়-কুটুম্ব- হিতৈষী বন্ধুদের সহায়তায়।

গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে। বরযাত্রীরা গতকাল সন্ধ্যেবেলা এসে পৌঁচেছে এবং চণ্ডীমণ্ডপের লাগোয়া ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তাদের। বিয়ের লগ্নের বেশী দেরী নেই। কনে সাজানো হয়ে গেছে। কনেকে ঘিরে আত্মীয়া-প্রতিবেশিনীরা নানারকম ঠাট্টা রসিকতা করছে। ঘরের এক কোণে মাথা হেঁট করে বসে আছে কাদম্বিনী। পনেরো বছর বয়সে সে সব ঠাট্টা, রসিকতা বোঝার বুদ্ধি ও অনুভূতি হয়েছে তার। তার সমবয়সী আত্মীয়-পরিচিত মহলের মেয়েরা এখন সকলেই বিবাহিত, অনেকেরই কোলে-কাঁখে-পেটে দু'একটি এসেছে। যাদের আসেনি তাদের মনে দুশ্চিন্তার অঙ্কুর মাথা চাড়া দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

বাইরে ম্যারাপের নীচে সভা আলো করে বসে আছে মাথায় টোপর পরা বর। সেখানেও বয়স্যদের হাস্যপরিহাস ঠাট্টা মস্করা চলছে। এই আনন্দোচ্ছল উৎসব-পরিবেশের যে কি নিদারুণ পরিণতি ঘটবে, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি কেউ। অথচ ঘটনাপথ ইতিমধ্যেই সেই নিষ্করুণ বাঁক নিয়েছে। একটি ঘরে ভেজানো দরজার অন্তরালে বরকর্তা ও বরপক্ষের মাতব্বর আরও ক'জন বিতৃষ্ণ চোখে চেয়ে রয়েছেন হরিশ মুখুজ্যে ও তাঁর শ্যালক ভবানীর দিকে। হরিশ মুখুজ্যের হাতে টাকার বাণ্ডিল। ভদ্রলোক টাকা হাতে নিয়ে গলবস্ত্রে সাধাসাধি করছেন, আর পাত্রপক্ষ রাগত মুখে হাত গুটিয়ে বসে আছে। যেন টাকা নয়, ঘৃণ্য কোন বস্তু গছাতে চান হরিশ মুখুজ্যে।

অথচ এরকম হ'বার কথা নয়। কনে বিবাহমণ্ডপে আনার আগেই দেনা- পাওনা সব হিসেব মিলিয়ে নেবার কথা এবং সেই উদ্দেশ্যেই ওঁদের ডেকে ভিতর বাড়ির এক প্রান্তে এই ঘরে এনেছেন হরিশ মুখুজ্যে। টাকাও গোনা-গাঁথা আছে, কম-বেশীর প্রশ্ন নেই। কিন্তু পাত্রপক্ষ অদ্ভুত একটা দাবী তুলেছেন হঠাৎ। মেয়ের গায়ের গয়না খুলে নাকি এখুনি যাচাই করে নেবেন। সালঙ্কারা কন্যার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে ফর্দ মিলিয়ে হিসেব কষে তুষ্ট হবেন না ওঁরা। এদিকে হরিশ মুখুজ্যে একেবারেই রাজি নন তাতে। ও পক্ষ যত চাপ দেয়, উনি তত আপত্তি জানান। অবশ্য আপত্তি মানে জোর গলায় নয়, তবে হাত জোড় করে কাকুতি মিনতি করলেও বোঝা গেল মেয়ের গয়না যাচাইয়ের প্রস্তাবে যে কোন কারণেই হোক, কোনমতেই প্রস্তুত নন।

শেষ অবধি ব্যাপার চরমে পৌঁছলো।

ভবানী বললো, "জামাইবাবু, ওঁরা যখন কিছুতেই ছাড়বেন না, ঠিক আছে, নিয়ে আসুন গয়না।"

হরিশ মুখুজ্যে গোঁজ হয়ে বলেন, "না, সে হয় না।"

হবু বেয়াই বলেন, "কেন, হবে না কেন শুনি?"

"সে আপনারা বুঝবেন না।"

ও তরফের মাতব্বর গোছের একজন বললেন, "না, তা বুঝবো কেন, আমরা ঘাস খাই কিনা। তাই গিল্টি সোনার গয়না দিয়ে মেয়ে গছাতে গেছিলে। চল হে হরিহর, খুব শিক্ষা হ'ল।"

ওঁরা বাইরে বেরোবার উপক্রম করতে ভবানী পথরোধ করলো, "ঠিক আছে, আপনাদের কথাই রইলো। যান জামাইবাবু, আর দেরী করবেন না। নিয়ে আসুন ওগুলো।"

হরিশবাবু কিন্তু উঠলেন না। তেমনি নিশ্চেষ্টভাবে বসে রইলেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জলের ফোঁটা পড়তে লাগলো। বড় সাধ ছিল মেয়েটার ভাল ঘরে বরে বিয়ে দেবেন। গত চার বছরের নিষ্ফল চেষ্টায় এটুকু বুঝেছিলেন যে মোটামুটি ভাল পাত্রের জন্য যে পরিমাণ টাকা ঢালতে হ'বে, তা তাঁর সাধ্যের বাইরে। তবু শেষ পর্যন্ত এমন ভাল সম্বন্ধটি যে কি করে জোটালেন এবং পাত্রপক্ষের খাঁই মেটাবারই বা কি ব্যবস্থা করেছেন, সে রহস্য তিনি কারো কাছে ভাঙ্গেননি।

পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে ব্যাপারটা দারুণ বিস্ময়কর ঠেকেছিল এবং তাদেরই মধ্যে করিৎকর্মা কেউ বরপক্ষের কাছে তার সন্দেহটি ব্যক্ত করে। সেই আন্দাজে ঢিল যে এভাবে লক্ষ্যভেদ করবে কে ভেবেছিল। হরিশ মুখুজ্যে যে বরপণের টাকার অঙ্ক কম রেখে গয়নাগাঁটির দিকটা ভারী করতে চেয়েছিলেন তাতে বরপক্ষের মনে সন্দেহ জাগেনি; কারণ ভদ্রলোক নিজেই বুঝিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর পক্ষে নাকি এতেই সুবিধে। গিন্নী তাঁর শাশুড়ি দিদিশাশুড়ির গয়নাগাঁটি পেয়েছিলেন প্রচুর, তাছাড়া তাঁর বাপের বাড়ি থেকেও দিয়েছিল যথেষ্ট। কাজেই নিজের মেয়ের বিয়েতে গয়না বেশী দিতে গায়ে লাগবে না, নগদ টাকা দিতে হ'লে ঘরের

সোনা বেচতে হ'বে বেশ কিছু লোকসান দিয়ে।

কথাটা হবু বেয়াইয়ের মনে ধরেছিল। তাদের মোটামুটি সচ্ছল সংসার, মাসান্তে মাইনে যা পান তাতেই চলে যায়। সঞ্চয় অবশ্য বিশেষ নেই, তেমনি অভাবও নেই। নগদ টাকা পেলে মাইনের টাকার মত খেতে পরতেই উড়ে যাবে। সোনা বরং ঘরে থাকবে। মেয়ের বাপ যে ভিতরে ভিতরে এমন জোচ্চুরি ফেঁদে রেখেছে কে জানতো তা। গ্রামের সাদাসিধে সরল মানুষ মনে হয়েছিল, সে যে আসলে একটা আস্ত ঘুঘু, কল্পনাও করেননি ওঁরা।

উঠোনের ওপাশে সারি সারি উনোন পেতে ভিয়েন বসেছে। রান্না অর্ধেকের বেশী নেমে গেছে। মাটির খুরি, গেলাস ধোয়া হয়ে গেছে সকালেই। কলাপাতা কেটে স্তূপ করে রাখা আছে এক পাশে। উৎসবের আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, এমন সময় বজ্রপাত হ'ল।

বরের অভিভাবক এসে জলদগম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন এবং সেই ডাক শুনে টোপর ও মালা-চন্দনে ভূষিত বর উঠে দাঁড়ালো এবং সুড় সুড় করে দলবল সহ প্রস্থান করলো। অবশ্য বিবাহ সভা ছেড়ে গেলেও তখনি কোলকাতা রওনা হ'বার উপায় নেই তাঁদের; কারণ কোলকাতার ট্রেন আসবে সেই ভোর রাত্তিরে। স্টেশনও এখান থেকে ক্রোশ খানেক পথ। তবু এই তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এ গ্রামে আর কালক্ষেপ না করে অনভ্যস্ত মেঠো পথ ধরে স্টেশন অভিমুখে পাড়ি দেওয়াই শ্রেয় মনে করলেন ওঁরা - রুচি ও নিরাপত্তা দুই দিক বিচার করে।

কন্যা তরফের কেউই তাঁদের বাধা দেবার বা সাধাসাধি করার চেষ্টা করলো না, কারণ ব্যাপারটা সবারই কানে গেছে ততক্ষণে। অমন শাঁসালো পাত্রকে যে তার বাপ এক কথায় জলাঞ্জলি দেবে প্রাপ্তির আশা ছেড়ে, এমন দুরাশা করে না কেউ, দোষও দেয় না তাঁকে। বরং হরিশ মুখুজ্যে যে তার পূর্বপুরুষের মুখে এভাবে চূণকালি লেপন করলো, তারই চাপা সমালোচনা ও ছিৎকার-গুঞ্জন উঠলো চারিপাশে। অবশ্য তার জন্য সময় পালিয়ে যাবে না, গঞ্জনা-ভর্ৎসনা- অপমান-অসম্মান হরিশ মুখুজ্যের জন্য তোলা থাকবে, তার বাকী জীবনের পাথেয় রূপে।

কিন্তু আরও যে একটি অবশ্য-করণীয়, অচিরে-করণীয় কর্তব্য পড়ে রয়েছে, তা হ'ল হরিশ মুখুজ্যের কন্যাকে পাত্রস্থ করা। এই লগ্নে বিয়ে দিতেই হ'বে, সে যে করেই হোক। কিন্তু দেবে কে?

হরিশ মুখুজ্যে ঘরের কোণে জবুথবু হয়ে বসে আছেন বাক্যহারা হয়ে। ফ্যাল ফ্যাল করে সামনের ফাঁকা দেয়ালের দিকে চেয়ে আছেন ফাঁকা দৃষ্টি মেলে। মেয়ের মা মুহূর্মুহূ মূর্ছা যাচ্ছে। ভবানী পাগলের মত ছুটোছুটি করছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে। অবশেষে গ্রামের চাঁই ক'জন এগিয়ে এলেন। ভবানীকে এক প্রান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিম্নস্বরে কিছু বললেন। ভবানী হরিশ মুখুজ্যের কাছ থেকে ঘুরে এলো একবার। তারপর সেই মাতব্বর ক'জনের পিছু পিছু গলবস্ত্র হয়ে এগিয়ে গেল বিবাহসভার দিকে।

বরযাত্রির দল চলে গেলেও গ্রামের নিমন্ত্রিত লোকেরা তখনও রয়েছে সেখানে, অবশ্য নিমন্ত্রণ রক্ষার প্রত্যাশায় নয়। তবে সবাই যে তামাশা দেখার জন্যে বসে আছে তাও নয়। ঘটনার আচমকা পরিবর্তনে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে অনেকে, কেউ কেউ সত্যিই সহানুভূতি অনুভব করছে বিপন্ন পরিবারটির জন্য।

ফণীভূষণ ভট্চাজ বিমর্ষ চিত্তে বসে বসে দেখছেন সব। নিজের দু'টি মেয়েকে পাত্রস্থ করেছেন তিনি। আরও চারটি কন্যা অনূঢ়া রয়েছে এখনও। তাদের মধ্যে বড়টি এগারোয় পা দিয়েছে, ছোটটির বয়স সাত। কন্যাদায় যে কি দায়, মর্মে মর্মে বোঝেন তিনি। ভট্চাজ অন্য গ্রামে থাকেন, যজমানি করতে এদিকে আসেন কালেভদ্রে। এবারও তাই এসেছিলেন এবং ঘটনাচক্রে আটকে পড়েছেন। হরিশ মুখুজ্যে তার যজমান গোষ্ঠিতে না পড়লেও এবং পরিচিত মাত্র হ'লেও কন্যার পিতা হিসেবে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে হতভাগ্য লোকটির এই আকস্মিক বিপদে; যদিও এই দুর্বিপাকের জন্য হরিশ মুখুজ্যেও যে দায়ী, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন না বা তাঁর অসাধুতাকে মার্জনা করেন না। তবু কি দুঃখে যে হরিশ মুখুজ্যে এমন একটা কাণ্ড করে বসলো তা যেমন তিনি বুঝতে পারেন, মানুষটা যে এত দুঃখ কষ্টের জীবনের সান্ত্বনা ও শেষ সম্বল, বংশপরম্পরাগত সম্মান ও সুনামটাও খুইয়ে বসলো এবং পরিবর্তে একেবারে কোন কিছুই পেলো না, এই ব্যথাটাও তাঁর বুকে বাজে। তাঁর

আশেপাশে লোকেদের জটলা এবং উত্তেজিত চাপা গলার আলোচনায় যোগ না দিয়ে ব্যথাতুর মুখে চুপ করে বসেছিলেন তিনি।

এই সময় গ্রামের ক'জন প্রৌঢ় ব্যক্তি ভবানীকে নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হ'লেন এবং ভবানী তাঁর দুই পা চেপে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। ফণীভূষণ ভট্চাজ শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াতে গেলেন কিন্তু পা দু'টি ভবানীর বাহুবেষ্টনে আটকা থাকায় তা সম্ভব হ'ল না।

বসে বসেই বিস্মিত ব্যাকুল প্রশ্ন করলেন, "একি? একি?"

উত্তরে ভবানী ডুকরে কেঁদে উঠলো, "দোহাই ভট্চাজ মশাই, আমাদের বাঁচান। তা না হ'লে আপনার সামনে মাথা খুঁড়ে মরবো আমি।"

এই বলে ভবানী মাথা ঠুকতে উদ্যত হ'তে মাতব্বর মত একজন তাকে থামিয়ে বললো, "ভেবো না ভবানী, ভট্চাজ মশাইয়ের দয়া মায়া আছে। এত বড় সর্বনাশ উনি কিছুতেই হ'তে দেবেন না।"

এরপর তাঁরা ব্যাপারটা ফণীভূষণকে প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দেন। লগ্ন বয়ে যাচ্ছে, এখুনি পাত্রস্থ না করতে পারলে এই অনূঢ়া, অরক্ষণীয়া কন্যা গলায় গেঁথে শুধু এই পরিবারটিই ধ্বংস হয়ে যাবে না, চতুর্দশ পূর্বপুরুষের পিতা প্রপিতা-মহদেরও স্বর্গ থেকে নেমে এসে ঝলসাতে হ'বে অনন্ত নরকধামে। এই ভরাডুবি থেকে সব দিক রক্ষা করতে পারেন একমাত্র ফণীভূষণ ভট্চাজ, কন্যাটিকে গ্রহণ করে। একেবারে শাঁখা-সিঁদুরেও নয়। অলঙ্কারগুলি মেকি হ'লেও বরপণের টাকা এবং দানসামগ্রীর লেপ-তোষক-মশারী ও তৈজসপত্রগুলি খাঁটি এবং এ সমস্ত তিনিই পাবেন।

প্রস্তাব শুনে প্রথমে হাঁ হয়ে গেলেন ভট্চাজ মশাই। তারপর খানিকপরে ভাষা খুঁজে পেয়ে ওজর আপত্তি জানালেন। তবে সময় খুবই কম। ইতিমধ্যে একজন নতুন একখানা ধুতি এনে তাঁর হাতে ধরিয়ে দিয়ে গেল। ফণীভূষণ তাড়াতাড়ি পরনের জামাকাপড় ছেড়ে নতুন বস্ত্র পরে পিঁড়েয় এসে বসলেন। বিয়ে হয়ে গেল। নবদম্পতিকে বাসরে পৌঁছে দিয়ে এলো কে একজন।

বাসর নামেই বাসর। ভাঙা বাসরই বলতে গেলে। ঘরের সাজ-সজ্জা সাঙ্গ হ'বার আগেই বিপর্যয় নামলো, ফলে বাসর সাজানোর মত মন মেজাজ ছিল না কারও। বাসর জাগারও নয়। প্রতিবেশিনীরা অনেকেই বাড়ি ফিরে গেছে, দু'চারজন যারা আছে তারা জল-পাখা নিয়ে মুখুজ্যে গিন্নীর পরিচর্যায় ব্যস্ত। বাসরঘরে একটা হারিকেন জ্বলছে, দরজা ভেজানো। হারিকেনের আলোয় নবপরিণীতা বধূর দিকে আড়চোখে বারকতক দেখলেন ফণীভূষণ। মনে মনে অবাক মানলেন। ক'ঘন্টা আগেও কি উনি কল্পনা করতে পেরেছিলেন এ রকম একটা পরিস্থিতি হ'বে? একেই বলে ভবিতব্য। ভবিতব্যের উপর হাত নেই মানুষের, মানুষের কর্তব্য শুধু তাকে মেনে নেওয়া। ফণীভূষণও নতমস্তকে ভবিতব্যকে মেনে নিতে তৎপর হ'লেন।

তাঁর চাদরের খুঁটের সঙ্গে কনের আঁচল বাঁধা। চাদর গা থেকে নামিয়ে কনের কোলের উপর জড়ো করে রাখলেন। তারপর উঠে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে পায়ে পায়ে কনের কাছে ফিরে এসে তার পাশে বসলেন। তারপর দুই হাতে টান দিলেন তাকে। কাদম্বিনী টাল সামলাতে না পেরে ফণীভূষণের গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো। তার ঘোমটা ও আঁচল খসে গেল। ফণীভূষণ রুদ্ধশ্বাসে সেদিকে চেয়ে রইলেন। কাদম্বিনীর লাবন্যঘেরা নরম, নিটোল কুমারী শরীর যেন নেশা ধরিয়ে দিল বিগতযৌবন প্রৌঢ়ের সর্ব শরীরে।

কাদম্বিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে সরে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু ফণীভূষণের দেহে অসুরের শক্তি এসে গেছে হঠাৎ। এক হাতে তাকে চেপে ধরে অন্য হাতে কমলকলির মত আধফোটা কচি দেহখানা নগ্ন করে উন্মত্ত ভ্রমরের মত সুধাপানে রত হ'লেন তিনি। কিশোরী বধূর কাজল কাল চোখের বিহ্বল আতঙ্ক ও নীরব মিনতি নিষ্ফল উষ্ণ ধারায় গড়িয়ে পড়লো তার দু'গাল বেয়ে। শবদেহের মত নিস্পন্দ, নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো কাদম্বিনী। মনে মনে সব ক'টি দেবদেবীর পায়ে মাথা খুঁড়লো সে। কেউ তাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো না।

দৃশ্যান্তরে আর একটি গ্রাম। সরলাবালা স্নান সেরে সকাল সকাল রান্না-বান্নার পাট চুকিয়ে বড়ি দেবার তোড়জোড় করছেন। উঠোনে রোদে চাটাইয়ের উপর পরিষ্কার কাপড় বিছিয়ে তার চার কোণায় চারটে ইঁট-

পাথর চাপা দিয়েছেন। এক গামলা ডালবাটা সামনে নিয়ে উবু হয়ে বসে ক্রমাগত ফেটাচ্ছেন; এমন সময় মণিবাবু ও কয়েকজন বর্ষিয়সী মহিলা প্রবেশ করলেন। সরলাবালা বাঁ হাত দিয়ে ঘোমটা টেনে উঠে দাঁড়ালেন।

মণিবাবু বার দুই কেশে গলা পরিষ্কার করে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। বললেনও শেষ পর্যন্ত, কিন্তু সরলাবালা কিছু বুঝতে না পেরে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন শুধু। মহিলারা আরও প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝাতে গেলে সরলাবালা হুঁ-হাঁ কিছুই বললেন না, দড়াম করে পড়ে গেলেন সেই পিতলের গামলার উপর। কপালের এক পাশ কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো, ফেঁটানো ডালবাটা মাথাময় মাখামাখি হয়ে গেল। মহিলারা উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে ফণীভূষণের মুণ্ডপাত করতে লাগলেন, এমন সতী-লক্ষ্মীর গলায় সতীন গেঁথে দিলেন বলে।

ক্রমে অন্যান্য পাড়া-প্রতিবেশিনীরাও এসে জুটলো। কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। খানিক বাদেই জ্ঞান ফিরে এলো সরলাবালার। ছবির মত নির্বাক, নিশ্চুপ। ওঁর কপালের ক্ষতে হলুদ লাগিয়ে দিল পাড়ার গিন্নীবান্নীরা। ভিজে গামছা দিয়ে ডালবাটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল। উনি বাধা দিলেন না। তারপর একসময় ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন এবং ভিটে থেকে বেরিয়ে গেলেন একেবারে এক বস্ত্রে। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলো অনেকে। কিন্তু পাথরকে কি যুক্তি তর্ক দিয়ে বোঝানো যায়! নিঃসাড় নিথর পাথরের মূর্তির মত ভাবলেশহীন মুখে সরলাবালা এগিয়ে চললেন গ্রামের মেঠো পথ ধরে। শেষে মণিবাবু নিজের বড় ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে সরলাবালাকে তাঁর বাপের বাড়ির গ্রামে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। গ্রামের আর পাঁচজনেও তাঁকে সমর্থন করলো।

বললো, "দু'চার দিন ভাই-ভাজের কাছে থেকে আবার ফিরে আসবে মাথা ঠাণ্ডা হ'লে। সতীন আসুক আর যাই আসুক, মেয়েমানুষের স্বামীর ঘর ছাড়া ঠাঁই নেই।"

সরলাবালা কিন্তু আর কোনদিনই ফিরে আসেননি। বালিকা কাদম্বিনী একক গৃহিনী থেকেছে সে বাড়িতে। রেঁধেছে-বেড়েছে, বড়ি-আচার-আমসত্ব দিয়েছে। সতীনের ছেলেমেয়েদের যত্ন করেছে। শুধু রাত্রি হ'লেই কি এক আতঙ্ক ঘিরে ধরতো। যেন এক ভয়াবহ দৈত্য গিলতে আসছে

তাকে। দৈত্যটা অবশ্য তাকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলে না। চিবিয়ে চিবিয়ে, কুরে কুরে, তারিয়ে তারিয়ে খায় নিত্য নতুন উৎকট পদ্ধতিতে। তারপর তার ভয়ে-মৃতপ্রায় শরীরটাকে জিইয়ে রাখে আগামী রাতগুলোর প্রতীক্ষায়। মাঝে মাঝে, দু'এক বছরের ব্যবধানে, অল্প কিছুদিনের বিরতি পায় কাদম্বিনী। তার মাতৃত্বের অজুহাতে। পর পর পাঁচটি সন্তানের জননী হ'বার পর কাদম্বিনীর নিশীথ রাতের বিভীষিকায় পাকাপাকিভাবে ছেদ পড়লো যখন এবং চুল ছেঁটে, হাত ন্যাড়া করে নরুণ পেড়ে ধুতি ধরলো সে, তখন তার বয়স চব্বিশ কি পঁচিশ।

- ২ -

তারপর প্রায় অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে। কাহিনীর স্থান কাল পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। দিল্লীর একটি ভিড়বহুল পাড়া। গ্রামের খোলামেলা উঠোন, বাগান, পুকুর - সে সব স্বপ্ন আজ। মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে দু'কামরার ফ্ল্যাট জোগাড় করাও দুষ্কর এখন, এক কামরার 'সেট' নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় অনেককে। দোতলা বাড়িটিতে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। নির্মলবাবুর ভাগে পড়েছে দোতলার কোণের দিকের বড় একখানা ঘর ও বাথরুম। ব্যালকনি ঘিরে ও মাঝে পার্টিশন দিয়ে একদিকে রান্নাঘর হয়েছে। অন্যদিকের অংশটিতে নির্মলবাবুর মা কাদম্বিনীদেবী থাকেন। অবশ্য খুব একটা অসুবিধে হয় না। পরিবারে মা ছাড়া স্বামী স্ত্রী দু'জন শুধু। ছেলে এন.ডি.এ.'তে; বৎসরান্তে একবার ক'দিনের জন্যে আসে। নির্মলবাবুর স্ত্রী লীলা একটি পাবলিক স্কুলে টিচার। শাশুড়ি-বউ'এ বনিবনা আছে। চতুর্দিকে রোজদিন চুরি-রাহাজানির মধ্যে খালি ফ্ল্যাট রেখে কাজে যাওয়া যে বিপজ্জনক সে বোধ লীলার আছে। কাজেই শাশুড়ি জপের মালা নিয়ে সাক্ষীগোপালের মত বসে থাকলেও সেই কর্মহীন উপস্থিতিটুকুর জন্য কৃতজ্ঞ সে। এবং বাড়ির আর চারটে ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাও।

দুপুরের দিকে সাধারণত একটু গড়িয়ে নেন কাদম্বিনী। কিন্তু আজ একটু সর্দিভাব হওয়ায় শুতে যাননি। তবে বহু বছরের অভ্যেস যাবে কোথায়। জপে বসে বারেবারেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে আসে তাঁর। শেষে কোনমতে জপ সেরে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ছাদের সিঁড়ি ক'টা পার হয়ে উপরে এলেন। বয়স হ'লেও এখনও একেবারে ভেঙে পড়েনি

শরীর। মাঝে মাঝে মাজায় একটা ব্যাথা ওঠে যার জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তবে এছাড়া আর বিশেষ কোনও উপসর্গ নেই। চোখ-কান সতেজ আছে এখনও। ছাদে উঠে আলসে ঘেঁষে দাঁড়ালেন কাদম্বিনী। রোজই একবার দু'বার আসেন সিঁড়ি ভাঙার কষ্ট স্বীকার করেও। এসে আলসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকেন চুপচাপ। আশেপাশের বাড়িগুলোর জীবনযাত্রা দেখেন। রাস্তায় মানুষের হাঁটা-চলা, ফেরিওলার আনাগোনা, কিছুই চোখ এড়ায় না।

দোতলায় ওঁদের পাশের ফ্ল্যাট থেকে গানের আওয়াজ ভেসে আসছে। নন্দিতা নামে মিষ্টি চেহারার মেয়েটা গান শিখছে - রবীন্দ্রসঙ্গীত। আঠারো ঊনিশ বছর বয়স মেয়েটার। হায়ার-সেকেণ্ডারি দিয়ে রেজাল্টের প্রতীক্ষায় উপস্থিত বাড়ি বসে আছে। গানের মাস্টার রাখা হয়েছে, হপ্তায় দু'বার বাড়ি এসে গান শিখিয়ে যায়। ভারি হাসিখুশি মেয়েটি, এই বয়সেও একটা আহ্লাদে-আদুরে ভাব। বাপ-মা'র একমাত্র সন্তান হ'লে যা হয়। কাদম্বিনীর কাছে এসে কত সময় আবদার জানায়।

বলে, "ও ঠামা, একটা গল্প বলো দিকি।"

ওর বয়সে দুই ছেলের মা হয়েছিলেন কাদম্বিনী আর এখন আঠারো ঊনিশ বছরের মেয়েরা ফ্রক পরে হাঁটু আলগা করে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে পুরুষ মানুষের সামনে।

হঠাৎ টপ্ করে এক ফোঁটা জল পড়লো কাদম্বিনীর গায়ে, আবার আর এক ফোঁটা। মুখ তুলে উপর পানে চাইলেন। কয়েক খণ্ড মেঘ জড়ো হয়েছে আকাশে, তবে এ মেঘ বেশীক্ষণ থাকবে বলে মনে হয় না। সর্দির উপর জলে ভিজে অসুখ বাধাতে রাজী নন কাদম্বিনী। তেমনি দু'এক ফোঁটা জলের ভয়ে এক্ষুণি নীচে নামতেও মন সরলো না তাঁর। সিঁড়ি ভাঙতে বেশ কষ্ট হয় আজকাল, কাজেই এখন নীচে গেলে আজ আর ছাদে আসা হয়ে উঠবে না। তাছাড়া ঘরে গেলেই হয়তো বসে বসে আবার ঝিম আসবে এবং শেষ অবধি ঘুমিয়ে পড়বেন। সর্দির উপর দুপুরে ঘুম মানেইনির্ঘাত জ্বর। ছাদের এক পাশে একটুখানি জায়গা টিনের শেড দিয়ে ঢাকা। কেন বা কি উদ্দেশ্যে যে জায়গাটাকে ছাওয়া হয়েছিল জানেন না উঁনি। এ বাড়িতে এসে অবধি এই রকমই দেখে আসছেন। বৃষ্টি বাড়ার সম্ভাবনায় কাদম্বিনী এখন সেই শেডের তলায় এসে দাঁড়ালেন।

এই বাড়িটা ইংরেজী 'এল' আকারের। ছাদের একপাশে দাঁড়ালে বাড়ির অন্য অংশটা পরিষ্কার দেখা যায়। এলোমেলো এদিক ওদিক দেখছিলেন কাদম্বিনী। হঠাৎ এক জায়গায় এসে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। ভয়ে আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো বয়সের ভারে কুঁচকে যাওয়া শ্বেতপক্ষ্ম চোখ দু'টি। কাদম্বিনী অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন। তারপর কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করলেন। একতলায় ঘোষেদের ড্রয়িংরুমে এ বাড়ির ও আশেপাশের দু'চারটে বাড়ির মহিলারা তাম্বোলায় রত ছিলেন। কয়েক দফা খেলার পর এখন সাময়িক বিরতি।

চা ও পাঁপর ভাজার ফাঁকে ফাঁকে কথার খই ফুটোচ্ছে সকলে।

এমন সময় দরজার ফ্রেমে দেখা দিল ভীত সন্ত্রস্ত কাদম্বিনীর ছবি। এতগুলো সিঁড়ি ভাঙার শ্রমে ও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন। কি যেন একটা বলার চেষ্টা করছেন। অনেক চেষ্টায় ওঁর কাঁপা কাঁপা গলার অর্ধস্ফুট বচনের মর্মোদ্ধার করে ভয়ে সিঁটিয়ে গেলেন সমবেত মহিলারা। মিসেস তালুকদার, অর্থাৎ নন্দিতার মা খেলায় কিছু টাকা জিতে বেশ ভাল মুডে ছিলেন এতক্ষণ, এবার আর্তনাদ করে কপালে করাঘাত করতে করতে দৌড়লেন নিজের ফ্ল্যাট অভিমুখে। তাঁর হাত থেকে টাকার নোটগুলো মাটিতে ছড়িয়ে পড়লো। আরও কতিপয় মহিলা তাঁর পিছু নিলেন। বাকীরা, যারা একটু সাবধানী ও বিবেচক, লোকজন ডাকতে ছুটলো আশেপাশে।

পুরুষরা বেশীর ভাগই কাজে বেরিয়েছেন। দু'একজন পারিবারিক বা শারীরিক কারণে বাড়ি ছিলেন। আরও দু'চারজন ছিলেন যারা কেউ বা অবসরপ্রাপ্ত, কেউ দেশভ্রমণে এসেছেন। এঁরা সব হাঁক ডাক শুনে নন্দিতাদের ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছলেন প্রায় মিসেস তালুকদারের পিছুপিছুই। কারণ এমন বিপদের খবর ছড়াতে এবং লোক জড়ো হ'তে সময় লাগে না এই লাগোয়া বাড়িগুলোয়। মিসেস তালুকদার চিৎকার করে বন্ধ দরজার উপর ছিটকে পড়লেন।

দাশুবাবুর শালা কোলকাতায় কলেজে পড়ে, ছুটিতে এসেছে। ছেলেটি চটপটে এবং বুদ্ধিমান। ও এরই মধ্যে চট করে নির্মলবাবুদের

ফ্ল্যাটে ঢুকে গিয়ে ওদের ব্যালকনি থেকে তালুকদারদের ব্যালকনিতে লাফিয়ে পড়লো। এবং সামনের দরজা খুলে দিল অবিলম্বে। নন্দিতা পলকে বাথরুমে অন্তর্হিত হ'ল। ছোকরা মাস্টার তাড়াতাড়ি পোষাক-আশাক গুছিয়ে নিতে তৎপর হতেই দাশবাবুর শালা দুই হাত দিয়ে কষে জাপটে ধরলো তাকে।

তরল কন্ঠে বললো, "থাক, খোকাবাবুর আর অত লজ্জায় কাজ নেই।"

ইতিমধ্যে 'বাড়িতে জরুরী কাজ' বলে মিস্টার তালুকদারকে ফোনে খবর দেওয়া হয়েছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে এসে পড়েছেন। এখন কিংকর্তব্য তারই শলা পরামর্শ করছে সবাই।

কাদম্বিনী দেবীর কাছ থেকে ব্যাপারটা আর এক দফা শুনে নেওয়া হ'ল এবং শেষ-মেশ সবাই মিলে এক বাক্যে রায় দিলো যে এমন একটা পয়লা নম্বরের বদমাইসকে ছেড়ে দেওয়াটাই একটা মারাত্মক রকমের ক্রাইম। কাছেই থানা। খবর দেওয়ামাত্র পুলিস এসে গেল। জন কয়েক সিপাই সহ একজন পদস্থ অফিসার। অফিসার নানারকম সওয়াল করলেন সবাইকে। নন্দিতা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, মাস্টারমশাই গান শেখানোর ফাঁকে হঠাৎ ছোরা বার করে কেমন করে ওকে কাবু করলো এবং বলেই আবার প্রবল বেগে কাঁদতে লাগলো। ছোরাটা অবশ্য এখন আর খুঁজে পাওয়া গেল না। নন্দিতার মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ওকে আর বেশী জেরা করলেন না অফিসার। মাস্টারকে নিয়ে পুলিস চলে গেল। সঙ্গে মিস্টার তালুকদার ও পাড়ার আরও ক'জন ভদ্রলোক গেলেন। বিকেলে অফিস থেকে সবাই ফিরে এলে এই ঘটনাটা নিয়ে সরগরম হয়ে উঠলো পাড়া।

রাত্রে কাদম্বিনী নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে জপের মালা হাতে বসেছিলেন। পাশের ঘর থেকে ছেলে ও ছেলের বউ'এর আলোচনা কানে এলো তাঁর। মাস্টার ছোকরাকে হাজতে পুরেছে পুলিস। বেশ কয়েক বছরের জেল ভোগ অনিবার্য তার।

সকালে শাশুড়ি নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরেও শয্যাত্যাগ না করায় লীলা তাঁকে জাগাতে এলো। কাদম্বিনীর গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলো

সে। দ্রুতপায়ে স্বামীর কাছে গিয়ে ডাকলো তাঁকে। নির্মলবাবু অফিসের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। স্ত্রীর পিছু পিছু কাঠের পার্টিশন করা ঘরখানিতে ঢুকে মা'র মুখের উপর ঝুঁকে পড়লেন। কাদম্বিনীদেবী চিরনিদ্রায় নিমগ্ন। তাঁর এ ঘুম আর ভাঙবে না কোনদিন। এক পরম প্রশান্তির আভা তাঁর মুখখানা ঘিরে রয়েছে। ঠোঁটের কোণে পরিতৃপ্তির হাসি।

ডাক্তার এলেন। বললেন, ঘুমের মাঝে কখন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো কালকের অতখানি উত্তেজনা সহ্য হয়নি এ বয়সে। এ পাড়ার বাসিন্দারা বহু বছর ধরে বৃদ্ধার উপস্থিতিতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছিল। সকলেই দুঃখ প্রকাশ করলো তাঁর তিরোধানে। একে একে সবাই এসে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেল। এলো না শুধু পাশের ফ্ল্যাটের নন্দিতা।

আড়ালে থুতু ফেলে বললো, "বজ্জাত বুড়ি! মরেছে না হাড় জুড়িয়েছে!"